দুই দিন

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

১২৮৫ সাল। সতেরোই শ্রাবণ।

ভাবনহাটি গ্রামের রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশচন্দ্র রায় আজ বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসবে বলে রামচন্দ্র রায়ের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকজন লোক জমেছে। রামচন্দ্র রায় ছেলের বিয়েতে যেতে পারেননি, আনন্দনাড়ু ভাজার দিন তেল জ্বলে উঠে হঠাৎ রান্নাঘরের চালে আগুন ধরে যায়। আগুন নেবাতে গিয়ে রামচন্দ্র রায়ের দুই হাত পুড়ে ঘা হয়েছে করতালুতে। সেজন্যে তিনি ছেলের বিয়েতে যাননি, বরকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন ভায়রাভাই তেবরের গোপেশ্বর চক্রবর্তীকে।

রামচন্দ্র রায়ের অবস্থা ভালো নয়। দুখানা মাত্র দু-চালা ঘর। কয়েক বিঘে ধানের জমি। বাড়ির পেছনে একটা খালের এক-চতুর্থাংশের মালিকানা স্বত্ব আছে, তাতে বছরে ত্রিশ-চল্লিশ মণ মাছ পান। এর দাম দশ টাকা হিসাবে মণ ধরলে তিন-চারশ টাকা। এ ছাড়া অন্য কোনো আয় নেই। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে এক রকম সংসার চলে যায়।

রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশের বয়স তেইশ বছর। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে স্থানীয় জমিদারি কাছারিতে মুহুরিগিরির কাজে ঢুকেছে। মাসিক বেতন ছ-টাকা।

ইতিমধ্যে সে গ্রামের সমবয়সীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

তাদের বাপ-মা তাদের বলে, সোনার চাঁদ ছেলে দেখগে যা রামু রায়ের ছেলে পরমেশ। ছাত্রবৃত্তি পাশ করলে দিব্যি—আবার ছ'টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরিতে ঢুকেছে। ওর উন্নতি ঠেকায় কেডা? তোরা শুধু বাড়ি বসে খাবি আর পাশা খেলবি চণ্ডীমণ্ডপে বসে!

ছ টাকা মাইনে পাওয়ার কথাটা একটু রটে গেল চারিধারে। ফলে ছেলের বিবাহের জন্যে নানা গ্রাম থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ধরে বসলেন আঁকড়ে এক কথা—একশ এক টাকা বরপণ দিতেই হবে। দশ ভরি সোনা—তা ছাড়া দানসামগ্রী, বরের গরদ আলাদা।

অনেকে বললে, বাপ রে, কি দেখে অত টাকা বরপণ দিতে যাবে লোকে? একশ টাকা বরপণ কারা পায়? যাদের ভালো জমিজমা আছে। তোমার কি আছে বাপু? ছেলে অবিশ্যি স্বীকার করি অল্প বয়সে চাকরিটা পেয়েছে ভালোই। কিন্তু ঐ যা ছেলে দেখেই দেওয়া। কম চাওয়া তো নয়। দশ ভরি সোনার দামই ধরো আঠারো টাকা ভরি হিসাবে একশ আশি টাকা। না না, ও চলে না।

আবার অনেকে বলে, চাওয়ার দিন এসেছে তাই চায়। কই, তুমি আমি তো চাইতে সাহসও করিনে! হীরের টুকরো ছেলে, এই বয়সে উন্নতি করেছে কেমন! আট টাকা তো ওর মাইনে হল বলে! ওকে দশ ভরি সোনা দেবে না তো দেবে কাকে?

অনেক মেয়ে দেখা ও উভয় পক্ষের যাতায়াতের পরে অবশ্য গোবরাপুরের তারিণী চক্রবর্তীর বড় মেয়ে পতিতপাবনীকে রামচন্দ্র রায়ের বেশ পছন্দ হল, তাঁরা বরপণ ও দশ ভরি সোনা দিতেও চাইলেন।

আজ সেই কনেকে নিয়ে পরমেশ বাড়ি আসছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতেই কথা উঠেছে—তাই তো, বৌ আসবার আগে নাড়ু ভাজার দিনই ঘরে আগুন লেগে গেল! শ্বশুরের হাত পুড়ে গেল! এ কি অলুক্ষণে বৌ রে বাবা!

রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী স্বামীকে নাড়ু ভাজার দিন শেষরাত্রেই কথাটা বলেছিলেন। তখন শেষরাত্রে দধি-মঙ্গলের শাঁখ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসানো হাতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বামীকে জাগিয়ে তুলে পরমেশের মা বললেন—ওগো শোন—

—কি গা?

—আমার মনডা ভালো বলছে না। সেই থেকে আমিও ঘুমুইনি। আমার কথা শোন, ওখানে ছেলের বিয়ে ভেঙে দ্যাও।

—পাগল! আজই বিয়ে, আজ বিয়ে ভেঙে দেবে?

—খুব দেওয়া যায়। অলুক্ষুণে কনে, ঘরে আগুন লাগে ভিটেতে পা দিতে না দিতে। আমার খোকা বেঁচে থাকুক, তার মুখের দিকে চেয়ে সংসারে সব করতে পারি তো ভারি একটা মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় না? কাল রাত্রে যারা যারা নাড়ু ভাজতে এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই একথা বলেছে—দিগম্বর চাটুজ্যের বৌ, ন'খুড়ি, পাড়ার মঙ্গল ঠাকরুন, কাশী চক্কত্তির শাশুড়ি—আমাদের মনমতি, ময়না, এরা ছেলেমানুষ এরাও বলছিল।

রামচন্দ্র রায় একটুখানি ঘাবড়ে গেলেন। ছেলের শুভ বিবাহের দিনটিতে এসব কি বিভ্রাট রে বাবা! বললেন—আচ্ছা দেখব, সেখানে আগে যাই তো।

—ছেলেকে আমি পাঠাব না কিন্তু।

—তবে দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজালে কেন? ওসব লোক-হাসাহাসির মধ্যে আমি নেই। একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করতে আমি পারব না।

—সর্বনাশ কিসে হল?

—ও কথা বোলো না গিন্নি। পরের দুর্দিনটা নিজের মতো দেখতে শেখো। আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে, মেয়েরও দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজল, কত লোক-কুটুম্ব এসেছে তাঁদের বাড়ি। কি সমাচার, না বর এল না। মেয়ে দো-পড়া হয়ে গেল। কান্নাকাটি উঠল চারিদিকে, রান্নাবান্নার জোগাড় সব নষ্ট। শত্রুরা মুখ টিপে হেসে মুখে আবার গা-ঘেঁষে দুঃখু জানাতে এল। কি দিন ভাব দিকি! ওসব ছেড়ে দ্যাঁও, পরের মন্দ করতে পারব না—এতে আমাদের ছেলের খারাপ হবে না গিন্নি, ভালো হবে। তুমি ওর মা, তুমি ভালো মনে ওকে আশীর্বাদ কর। তোমার পায়ের ধুলোতে ওর সব মঙ্গল।

পরমেশের মা স্বামীকে মানতেন। স্বামীর কথায় নরম হয়ে গেলেন। উনি যখন বলছেন, তখন কোনো ভয় নেই। উনি আমার চেয়ে অনেক বোঝেন। যা ভালো বোঝেন করুন। আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি!

তার পর বেলা হল। বরযাত্রী-ভোজনের যজ্ঞি চড়ে গেল। প্রায় ষাটজন বরযাত্রী হবে। তারা খেয়েদেয়ে সব রওনা হয়ে চলে গেল, কিন্তু রামচন্দ্র রায় গেলেন না—যেতে পারলেন না। সেই পোড়ার ঘায়ে বড় যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করল, একটু জ্বর-মতো হল দুপুরের দিকে। তাঁর ভায়রাভাই-এর হাতে বরকর্তার দায়িত্ব তুলে দিয়ে রামচন্দ্র রায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন কোণের ছোট্ট ঘরে।

স্ত্রী সন্ধ্যার পরে ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাঁগা, ঘুমিয়েছ?

—না।

—এ কি হল?

—কি হল?

—তোমার জ্বর, তুমি খোকার বিয়েতে যেতে পারলে না, এ কি কম কষ্ট আমার! ভেবে দ্যাখো, সেই খোকা আমাদের। আমার মন মোটেই ভালো নিচ্ছে না। চোখের জল ফেলছিনে পাছে খোকার অমঙ্গল হয়। কি অলুক্ষুণে বৌ আসছে সংসারে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

—গিন্নি, আবার সেই কথা? জ্বর মানুষের হয় না? জ্বর হয়েছে বলে একজন নিরীহ মেয়ের উপর রাগ কর কেন, তাকে অলুক্ষুণে বলই বা কেন? তার কি দোষ?

—কি খাবে রাত্তিরি? ও বেলা এত যজ্ঞি, তুমি কিছু মুখে দিলে না—

—একটু সাবু করে দিয়ে। আর কিছু ভেব না, ভগবানের নাম নিয়ে গিয়ে শুয়ে থাক। যে আসছে, তাকে তুমি আশীর্বাদ কর মন খুলে।

সেই নতুন বৌ নিয়ে পরমেশ এখুনি বাড়ি আসছে। কেননা দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া গেল। গরিবের ঘরের ঠাটবাট, আত্মীয় কুটুম্বিনীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, শাঁক নিয়ে দোরের বাইরে রাস্তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পরমেশের মা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোখে তাঁর ঔৎসুক্য, মুখে অনিশ্চয়তার হাসি।

রাস্তার মোড়ে বরকনের পালকি দেখা গেল।

পেছনে বাজনদার ভক্ত মুচি ও তার দল।

পালকির এপাশে গোপেশ্বর চক্কতি, পাত্রের বড় মেসো।

সকলেই এগিয়ে গেল।

কে একজন চেঁচিয়ে বললে—দুধ-আলতার খোরা ঠিক কর আগে!

গ্রাম্য বৌ-ঝিরা ঘিরে দাঁড়াল। পোঁ পোঁ শাঁখ বেজে উঠল। সুগঠিত-দেহ যুবক পরমেশ রায় পালকি থেকে নেমে মার পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। মা গিয়ে নববধূকে কোলে করে পালকি থেকে নামালেন।

তারপর কৌতূহলচঞ্চল হাতে বধূর ঘোমটা খুলে মুখ দেখলেন, হাতে দিলেন দুগাছা সোনার বালা। তাঁর শাশুড়ি, রামচন্দ্র রায়ের স্বর্গগতা মাতৃদেবী একদিন এই বালাজোড়া দিয়ে তার মুখ দেখেছিলেন এই ভিটেতে পা দেওয়ার দিনে।

পুত্রবধূর মুখ দেখে খুশি হলেন পরমেশের মা। কাঁটালতলায় বরণের পিঁড়ি পাতা ছিল, পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে ঘরে তুললেন।

বাঁশবনের মধ্যে বাড়ি।

অনেক রাত্রে লক্ষ্মী-পেঁচা ডাকছে বাঁশবনের মাথায়। ঝিঁঝি ডাকছে বনে। বধূ কি একটা ডাকে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে শয্যা-সঙ্গিনী ছোট ননদ হৈমবতীকে জড়িয়ে ধরলে।

—ওকি বৌদি, ভয় কি? ও-শেয়াল ডাকছে।

নববধূ ঘুম ভেঙে হেসে ননদের মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে চাইলে। কানের মাকড়ি দুটো ঠিক করে নিলে। হৈমবতী হেসে বললে—রও একটা দিন। কালই তো ফুলশয্যে। কাল থেকে দাদার কাছে শোবে, ভয়-ভাবনা কিছুই থাকবে না। ছটফট করে মরছ আমরা বুঝিনে বুঝি?

নববধূ সলজ্জ কণ্ঠে বললে—ওমা!

ওই দিনটির পরে দীর্ঘ আটষট্টি বছর কেটে গিয়েছে। আজ তেরশ তিপ্পান্ন সালের তেরই শ্রাবণ। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট এন. রায়ের আজ মাতৃশ্রাদ্ধ। লোকজনে বাড়ি পরিপূর্ণ।

ভাবনহাটি গ্রামে এঁদের বড় দোতলা বাড়ি, বৈঠকখানা, পুজোর দালান। এন. রায়ের পিতা ৺পরমেশচন্দ্র রায়ের আমলে দুখানা মাত্র খড়ের চালাঘর ছিল। পরমেশ রায়ের অবস্থা সামান্যই ছিল। স্থানীয় জমিদারি কাছারিতে নায়েবী করে কষ্টেসৃষ্টে দুটি ছেলেকে মানুষ করে গিয়েছিলেন। চারটি মেয়েকেও মোটামুটি পাত্রস্থ করেছিলেন।

বড় ছেলে নৃপেন্দ্রনাথ রায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, আজ সাত-আট বছর পেনশন নিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে, একটি গত মহাযুদ্ধে আই.এম.এস. মেজর ছিল, এখন ভবানীপুরে ডাক্তারি করে। ছোটটি এই বছরে নিজে কনট্রাক্টরির আপিস খুলেছে কলকাতায়। বিগত যুদ্ধে ধানবাদ অঞ্চলে কনট্রাক্টরি করে অনেক টাকা রোজগার করেছে। ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে সে গত ফাল্গুন মাসে তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ি কিনেছে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে। নৃপেন্দ্রনাথ রায় বকুলবাগানে বাড়ি করেছিলেন—ছোট একতলা বাড়ি বটে, তবে বেশ

চওড়া কম্পাউন্ডওয়ালা, ফুলবাগান আছে বাড়ির সামনে। চাকরি জীবনের অর্থ দিয়ে বছর ষলো-সতেরো আগে এই বাড়িটা তিনি করেছিলেন, এখন ছেলেরা এই বাড়িতেই থাকে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতাতেই। বলা বাহুল্য, সম্পন্ন ঘরেই।

নৃপেনবাবু চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে পৈতৃক ভিটেতে এই বড় দোতলা বাড়ি করেন। পুজোর দালানে কয়েক বছর দুর্গোৎসবও করেছিলেন। তখন পরমেশ রায় বেঁচে ছিলেন।

পিতার পরলোকগমনের পর নৃপেনবাবু কয়েক বছর দেশে যাতায়াত করেছিলেন, তার পর আর বড় একটা আসতেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইতেন কর্মস্থানে; বৃদ্ধা বলতেন—না বাবা, আমার কাছে শ্বশুরের এই ভিটেই গয়া কাশী। এ ফেলে কোথাও যাব না। বৌমার শরীর এখানে টেকে না ম্যালেরিয়াতে, বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও সঙ্গে।

তখনো পর্যন্ত নৃপেনবাবু স্ত্রীকে বৃদ্ধা মায়ের কাছেই রেখেছিলেন।

ব্যস, ভাবনহাটির বাস উঠে গেল।

শুধু বুড়ি থাকে, বড় বাড়ির ঘর প্রদীপ দেয়। ছেলেদের তৈরি বাড়ি, কত আনন্দের, কত আহ্লাদের! লোকের কাছে বলে সুখ, দেখিয়েও সুখ। ছোট ছেলেও এই বাড়ি করতে টাকা দিয়েছে, দুই ভাইয়ের টাকাতে বাড়ি, তবে বড় খোকা নৃপেন বেশি টাকা দিয়েছে। ছোট ছেলে বীরেন দাদাশ্বশুরের পসারে বসে গোয়াড়ি কেষ্টনগরে ওকালতি করে, সেখানে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বাড়িঘর সব তার। সে ক্বচিৎ ভাবনহাটি আসে। তার অবস্থা মন্দ নয়।

পরমেশ রায়ের পরলোকগমনের পর বুড়ি অনেক দিন বেঁচে ছিল। আশি বছর বয়স হয়েছিল মরবার সময়। একবার বড় ছেলে নৃপেন রায়ের খুব অসুখ করে। বুড়ি ভাবনহাটি থেকে ছেলেকে দেখতে যায় বহরমপুরে। তখন নৃপেন রায় বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। বুড়ি বলেছিল—তোকে রেখে আমি যাবই খোকা—কোনো ভাবনা নেই, তুই সেরে উঠবি। আমি এই পায়ের ধুলো দিলাম তোর মাথায়, এই তোর বড় ওষুধ।

প্রায় পঁচিশ বছর এই বাড়িতে একা প্রদীপ দেওয়ার পরে এবার বুড়ি স্বামীর ভিটের পুণ্য মৃত্তিকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন গত ২রা ফাল্গুন।

প্রকাণ্ড শ্রাদ্ধসভা। মেজর রায় সব দেখাশুনো করে বেড়াচ্ছেন—বুড়ির জ্যেষ্ঠ পৌত্র। সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা, চোখে চশমা। কাকে বলছেন—কনট্রোলারকে লিখে এক মণ ময়দা অতিকষ্টে জোগাড় করেছিলাম—আর কলকাতায় রেশন কার্ডে কিছু কিছু কালেক্ট করে। ভাবনহাটি গ্রামের লোক খুব বেশি হয়েছে।

এরা গ্রামের মধ্যে বড়লোক, অনেকদিন পরে দেশে এসেছে, মাতৃশ্রাদ্ধ করছে, একটা বড় ভোজ দেবে। তবে মুশকিল এই যে, না মেলে আটা-ময়দা, না মেলে চিনি। এরা বড়লোক তাই যেখান থেকে হোক জোগাড় করেছে এই বাজারে। শ্রাদ্ধসভা একটা দেখবার জিনিস হয়েছে।

বড় শামিয়ানার নীচে শ্রাদ্ধবেদী। তেরোটি নাতি মুণ্ডিতমস্তকে যখন দীর্ঘ সারিতে কুশাসনে বসে ভুজ্যি উৎসর্গ করছে—তখন গ্রামের বুড়ি চক্কত্তি-গিন্নি বললেন—আহ-হা, ভাগ্যিমানী চলে গেল। কি ভাগ্যিই নিয়ে এসেছিল। আজ সোনার চাদেরা বসে দেখ ভুজ্যি উচ্ছুগুঁও করছে। এ ভাগ্যি কি সবার হয়? বট্‌ঠাকুরের কী ছিল, দুখানা চালাঘর! আমরা প্রথম ঘর করতে এসে দেখেছি। দিদি আর কত বড় ছিলেন আমার চেয়ে—না হয় দশ-বছরের। সে বাড়িতে রাজ-অট্টালিকা তুলেছে ছেলেরা, আবার নাতিরা হয়েছে একেবারে রাজা। এমন ভাগ্যি নিয়ে কজন মেয়েমানুষ বসুমতীতে আসে বল—

নাতি মানে শুধু ছেলের ছেলেরা নয়, চার মেয়ের ছেলেরাও আছে।

নৃপেন রায়ের ছোট ছেলে কন্ট্রাক্টর পরিতোষ বেদি থেকে হেঁকে বললে,—বিজয়, গাড়ি গিয়েছে?

বিজয় বিনীতভাবে বললে—দারোগাবাবুর মেয়েছেলে আনতে গিয়েছে গাড়ি। এখনো ফেরেনি।

—ফিরলে সাবডেপুটির বাড়ির মেয়েদের আনতে পাঠাতে হবে—এবার বড়খানা পাঠিয়ো।

—যা জল-কাদা সার, গাড়ি চালানো বড় দায় হয়েছে। বড় গাড়ি বেরিয়ে গিয়েছে রাণাঘাটে ছানা আনতে।

—যে করে হোক, একটা-দুটো দিন চালিয়ে নিতে হবে।

পাঁচ মাইল দূরবর্তী মহকুমা টাউন থেকে নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আনবার জন্যে দুখানা নিজেদের মোটর এরা কলকাতা থেকে এনেছে। রাণাঘাট এখান থেকে অনেক দূর, ভালো রাস্তাও নেই, সেখানে গাড়ি পাঠানোর কথায় পরিতোষ বললে, সেখানে গাড়ি পাঠাতে কে বললে? সে তো যোলো মাইলের কম নয়—

বিজয় বললে—সতেরো মাইল সার।

—যত সব স্টুপিড!—তারপর একখানা টায়ার গেলে কি স্প্রিং ভাঙলে এ বাজারে জোগাড় করাই কঠিন—যা রাস্তা! ভালো গাড়িখানাই ওই রাস্তায় পাঠালে!

এই সময়ে জীপগাড়িতে মহকুমা হাকিম ও দুজন গভর্নমেন্টের কর্মচারী এসে নামলেন।

মেজর রায় বেদি থেকে বললেন, আসুন, আসুন—ওরে গাড়ি থেকে কি কি আছে নামিয়ে নে—আসুন দয়া করে—

মহকুমা হাকিম মি. সেন পূর্বে ছোকরা বয়সে নৃপেন রায়ের অধীনে সার্কেল অফিসারের কাজ করেছেন মেদিনীপুরে, কাঁথি মহকুমায়। জীপ থেকে নেমে মি. সেন বললেন—আপনার বাবা ? ও! নমস্কার সার—আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কাজ আরম্ভ করুন, আমাদের জন্যে ভাববেন না। উই আর কোয়াইট অ্যাট হোম!

—কে আছিস, ওরে? সিগারেটের টিন বার করে দে ওঁদের—চায়ের ব্যবস্থা আগে কর।

এই সময় গোয়ালারা দই আর ক্ষীরের বাঁক নিয়ে উঠোনের এক স্থানে এসে দাঁড়াল। ও পাশে ছোট চালাঘরে মিহিদানা ও দরবেশ ভিয়ান হচ্ছে, লুচির ময়দা মাখা হচ্ছে—সে ঘর থেকে একজন উঠে এসে গোয়ালাদের দই আর ক্ষীর দেখে নামিয়ে হিসেব করে নিতে লাগল।

জার্মান সিলভারের ট্রেতে চা দেওয়া হচ্ছে, শামিয়ানায় চেয়ারে বসে যেসব ভদ্রলোক শ্রাদ্ধ দেখছেন তাঁদের এবং বিশেষভাবে মহকুমার হাকিম ও তাঁর দুজন সঙ্গীকে।

গ্রামের সাধারণ লোকও শামিয়ানার একপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য। তেরোটি সোনার চাঁদ নাতি একসঙ্গে ভুজ্যি উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করছে।

একটু দূরে সেই কাঁঠালগাছটা। যখন এটা অল্প কয়েক বছরের চারা তখন এরই তলায় দুধেআলতায় গোলা পাথরের খোরায় পরমেশ রায়ের নববধূ এসে দাঁড়িয়েছিল বরণের সময়, পাশেই আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন নবযুবক পরমেশ রায়। আটষট্টি বছর আগের এ খবর সভাস্থ কোনো লোক জানত না, জানবার কথাও না।